ধারাবাহিক রচনা

রেখায় লেখায় অবনীন্দ্রনাথ

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

অবনীন্দ্রনাথকে যেদিন স্যার আশুতোষ নিয়ে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, খয়রার রাজার বদান্যতায় রানি বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপে বরণ করলেন, একের পর এক বক্তৃতায় শিল্পী চমক লাগিয়ে দিলেন সমাগত পণ্ডিতদের, খুলে দিলেন নন্দনতত্ত্ব আলোচনার নতুন দিক, সেদিন তাঁকে ঘিরে কত না হর্ষ, কত না কোলাহল! ১৯২১ থেকে ১৯২৯ এই সময়পর্বে ঊনত্রিশটি বক্তৃতায় তিনি সহজ সাবলীল ভাষায় শিল্পের অন্তরকথা শুনিয়েছিলেন, সাধারণের বোধগম্যতায় নিয়ে এসেছিলেন অতি জটিল তত্ত্বকথাকে। শিল্প কী? কীভাবে তাতে অধিকার জন্মায়? কীভাবে গড়ে ওঠে তার ভাষা? কোথায় তার সৌন্দর্য? রূপ, ভাব, লাবণ্যের রহস্যই বা কী? সহজ উপমায় প্রতিদিনের ঘটমান বর্তমান থেকে উদাহরণ দিয়ে এইসব তত্ত্বকথাকে মেলে ধরলেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের অলংকারশাস্ত্র, প্রাচীন কাব্য, নাটক, বেদ, উপনিষদ, শুক্রাচার্যের শুক্রনীতি, মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশ, উজ্জ্বলনীলমণি, কালিদাস, বানভট্ট প্রমুখের রচনা, ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র—এই সবকিছুকে আত্মস্থ করেছিলেন তিনি, কিন্তু বক্তৃতায় সেইসব তত্ত্বকে এমনভাবে পরিবেশন করতেন যার মধ্যে না ছিল পাণ্ডিত্যের ভার, না তাত্ত্বিক কাঠিন্য। যেন নিজের চেনাজানা অনুভূতির জগতকে, উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সকলের সামনে তুলে ধরলেন বৈঠকী মেজাজে। মুগ্ধ হয়ে বাঙালি শুনল সেই সরস তত্ত্বকথা।

তবু সেই মুগ্ধতার রেশ যেন মিলিয়ে এল দ্রুত। দক্ষিণের বারান্দা ঘিরে উদ্দীপনায় এল ভাটার টান। এ সেই ঐতিহাসিক বারান্দা যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল সমগ্র ভারতীয় চিত্রচর্চার যুগান্তর। কত না দেশি-বিদেশি পণ্ডিত, অতিথি-অভ্যাগতের আগমনে ধন্য হয়েছে এই লাল মেঝে। জৌলুস এল কমে সেই দক্ষিণের বারান্দার। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর যার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, ''রং চটা লাল সিমেন্টের মেঝে, ফাট ধরছে মাঝে মাঝে। অতবড় সত্তর পঁচাত্তর ফুট লম্বা, বারো তের ফুট চওড়া, ডবল ডবল গল থাম, আকাশি ঝিলিমিলি-ওয়ালা টানা বারান্দায়—না আছে দেয়ালে একটা ছবি, না আছে একটা বর্শা, না তলোয়ার টাঙানো। একটি থামের গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখা ছিল, সম্ভবতঃ গুপ্তপিরিয়ডের ফুট দুই উঁচু একটি প্রস্তর মূর্তি; যার ওপরে ক্ষত রেখে গেছে কালপ্রবাহের গতি। আর ছিল বারান্দার পূব দক্ষিণ কোণে দেয়ালগিরি একপ্রস্থ মার্বেলের উপর বসানো তিনটি চিনেমাটির

টব—তাতে জাপানী বৃক্ষের পত্রপুষ্পান্বিত শোভা।"[১৭] এই বারান্দার অসামান্য বর্ণনা কবি জসীম উদ্দিনের কলমে : ''সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া একখানা ঘর পার হইয়া দক্ষিণ ধারের বারান্দা। সেখানে তিনটি বৃদ্ধলোক ডান ধারের তিনটি জায়গায় আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। কোথাও টু-শব্দটি নাই। দুই জন ছবি আঁকিতেছেন, আর একজন বই পড়িতেছেন। প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া আলবোলা। খাম্বিরা তামাকের সুবাসে সমস্ত বারান্দা ভরপুর... দীনেশদা (কল্লোল সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ) আমার কানে কানে বলিলেন, ইনিই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; আর ওপাশে বসে ছবি আঁকছেন, উনি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি বই পড়ছেন, উনি সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরা তিনজনে সহোদর ভাই।"[১৮]

এই তিন ভাইকে নিয়েই তাঁদের কাকা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

''হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ,
হাসির সমরে আর মৌন রহে না তার
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে।"

এই দক্ষিণের বারান্দাতে বসেই অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতেন, শিক্ষা দিতেন, পালা লিখতেন, পুঁথি লিখতেন। ক্রমে সব নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও সৃষ্টি আর সৃষ্টির মধ্য থেকে আনন্দ খুঁজে নেওয়ার তাগিদ থেমে রইল না। তা নিরন্তর বয়ে চলল, এক স্রষ্টার সৃজনী দক্ষতায় নতুন নতুন বিস্ময়ের দরজা খুলে বিস্মিত করে দিতে চাইল বিস্ময়কে। কতরকম মজার ঘটনাই না ঘটত তাঁর ছবি আঁকাকে ঘিরে। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর লিখছেন,

''যেদিন আমি ছবি-লিখতে যাই, সেদিনকার রগড়ের কাহিনীটি শোনাই তোমাকে,... একটানে আঁকা হয়ে যাক আমার গুরুদেবের চিত্রম্।

''এই ছবিটির পটভূমি,—দক্ষিণের বারান্দা। ঠিক হুটোপাটি নয়, নির্বাধে গতিবিধি করছে বাড়ির ছেলেরা। সেখানে অধুনা নিজের নিজের সিংহাসনে, বারান্দার পূর্বভাগে বসে রয়েছেন শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।... ছবি আঁকছেন গগনেন্দ্রনাথ, পরিধানে জোব্বা। এবং সমরেন্দ্রনাথ—থুৎনিতে ঔরঙ্গজেবী দাড়ি, লম্বা চোগা অঙ্গে, টুলের উপরে নিজের খড়ম্-পা তুলে দিয়ে;—কেতাব পড়ছেন। তাঁদের প্রণাম সেরে আশীর্বাদ নিয়ে যেই মাথা তুলতে যাব, অমনি শুনি, গগন ঠাকুর তাঁর হাল্কা আমীরী কণ্ঠে হেঁকে বলছেন—

'অবনের কাণ্ডটা একবার দেখেছ? বারান্দায়... সমুদ্দুর বইয়ে দিলে। পা ছপ্ছপিয়ে, জল ছিটিয়ে, এবার চলতে থাকুক সবাই।'

''বাক্যের অনুসরণ করে দেখি, আমার নবীন গুরুদেব তাঁর আসনটিতে বসে নেই। বারান্দার পশ্চিম-মুড়োয় অন্দরমহলের পার্টিশানের সামনে প্রকাণ্ড তক্তাপোষ পড়েছে একটা, এবং তার... উপরে, ধারে, এপাশে-ওপাশে ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মত টক্‌টক্ করে চর্কী ঘুরছেন অবন ঠাকুর। জামরঙের লুঙ্গি, জলে ভিজে গেছে; পিরাণের সাদা পুট-হাতা-আস্তিন রঙে রঙ! হাতে ফ্ল্যাটব্রাশ।—উঠছেন, বসছেন, ওয়াশ দিচ্ছেন, আর রহি-রহি হুঙ্কার—

'ঢাল্ জল, ঢাল্ জল—ছবির ভিতরে বাদ্‌শাহী গরম রয়েছে, বাবা,—গরমটা কমে যাক। কড়া লাইন নরম হোক। ঢাল্ জল...'

''তার পরেই হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন—'এই যে, এসে গেছিস্। ধর, কোণা ধর্। জলে অত ভয় কি রে? জল ঘাঁটতে হবে যে রে—চিরটা কাল। দ্যাখ, ছবি লেখবার সময়—সিল্কের জামা পরে কখ্খনো আসিস্নি। ছোপ ধরে ধরে

একেবারে পাকা রঙের পায়রার খোপ হয়ে যাবে... জামা। চেয়ারটার উপর জামাটা খুলে রাখ।... এবার কাজে লাগো শিষ্য, ধর্ দিকিনি কোণাটা।...দে রোদে,—এবার।... এবার শুকোও বাদশা;—রাজসিংগির হাতে যেমন করে শুকিয়েছিলে,—ঠিক সেই রকম।'

''প্রকাণ্ড ছ'ফুটি ছবিটিকে ধরাধরি করে, একবার রোদে ঝলসানো হয়, আবার একটু নরম থাকতে থাকতে তুলে এনে বর্ণ-সঙ্করিত করা হয়। বহুক্ষণ ধ'রে চলতে থাকে এই রকমের কীর্তিকলাপ। মেহন্নত না মেহন্নত! ছবি আঁক্‌তেও যে শিল্পীকে নিতান্ত ঘর্মসিক্ত হতে হয়, সে খবর অনেকেই জানেন না; কিন্তু যে পরিশ্রম-দানে একটি ছবি সফল হয়—তার শ্রম-মূল্য নির্ধারণের জন্য আজও কোনো ট্রাইবিউন্যাল সৃষ্টি হয়নি;—দুঃখের কথা! রোদ আর জলে যুগপৎ ভিজতে ভিজতে গুরুদেবের নাটুকে কথা শুনি—'বুঝেছিস্—রঙগুলোকে একেবারে সেঁদিয়ে দিতে হবে—কাগজের মগজে।... ভাসা রঙ চল্‌বে না রে জলছবিতে।...

'যত ভিজোবি আর শুকোবি, তত পরমায়ু বাড়বে জলের ছবির secret। ভেজাও ভেজাও...

'ছবির আবার immortality, আবার permanency! ও তো জলের হাতে আর রোদের হাতে।...

'—বাদশা এলে খুশি হোতেন। কি বলিস।'

''পার্টিশানের ধারে দুজন ভৃত্য এসে শেষে তুলে ধরল রৌদ্রশুষ্ক তসবির। গগন ঠাকুর চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন; বললেন—

'অবন, ব্যস, এইখানেই ইস্তফা দাও। আর কিছু করতে যেও না যেন ছবিতে। বললে তুমি শোনো না। শেষ ব'লে একটা জিনিস আছে।'

''সমর ঠাকুর সায় দেন, বলেন,—'উতরে গেছে। আমার এই নতুন দাড়ির নূরটার model না পেলে, কি আর অমন জ্যোতির্ময় দাড়ি আঁকা হতো বাদশার?'

''...এই ছবিটিই অবনঠাকুরের প্রসিদ্ধ 'আলমগীরের' (১৯২২) ছবি। মাউণ্টেড কাট্রিজ কাগজের উপর আঁকা। কী ভোগানটাই ভুগিয়েছিল আমায়,—চিত্রণ- শিক্ষার প্রথম দিনে। তাই ভুলিনি।

''ধুতির দুরবস্থা দেখে ভাবছি, কেমন করে রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরব! গাত্র-শ্লিষ্ট সিক্ত বসনটিকে তুলে ধরে রোদে শুকোতে থাকি কিন্তু পশ্যতু, গুরুদেবের হুঁশ বলে পদার্থটি নেই, এবং তাঁর তুলি সমানে বর্ণাঘাত করে চলেছে আলমগীরের বহিস্তলে। শেষে যখন 'রাধু' চাকর এল—খাস-চাকর—এবং গোল রুপোর ডিবেয় করে মনিবের সামনে তুলে ধরল চার খিলি পান, তখন 'আর নয়' বলে সোজা হয়ে, মাজা চিতিয়ে, দাঁড়িয়ে উঠলেন দীর্ঘ-তনু পুরুষ, থেমে বললেন—

'একটা পান খেয়ে নে, চল্, পাখার তলায় বসি।'

''তিনটি ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর গুরুদেবের মুখে ফুটে ওঠে এই স্বস্তির হাসি।''[১৯]

এমন কত সৃষ্টির সাক্ষী সেই দক্ষিণের বারান্দা। দীর্ঘকাল ছবি আঁকা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার পর নিজেকে সেই জগতে ফিরিয়ে এনেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, আর তাও ঘটেছিল এই বারান্দাতেই।

তাঁর ছাত্র ও শিষ্য মুকুল দে তখন আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল। হঠাৎ একদিন বারান্দায় এসে একটি বিরাট ছবি মেঝেতে বিছিয়ে রং শুরু করলেন, সন্দিহান চোখে সেদিকে তাকিয়ে অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমার মতলবখানা কী হে মুকুল?'' মুকুল বললেন, ''আজ্ঞে আপনি আপনার যাত্রা লিখুন, আমি এইখানে বসে ছবি আঁকব। বলে ধপ করে বসে পড়লেন মেঝেতে।[২০]

সেই ছবি যেমন বিশাল তেমন তার গাম্ভীর্য। চোখ তো সেদিকে যাবেই। পুরনো এক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, গায়ে ঝলমলে শাড়ি। যাত্রা লিখতে লিখতে উঠে এলেন অবনীন্দ্রনাথ, দাঁড়িয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর রং জল আর ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে শাড়ির রং দিলেন ধুয়ে, দামি অথচ পুরনো করে দিলেন। আবার একদিন মুকুল নীল যমুনার কোলে বসুদেব আঁকছেন, অথচ যমুনার ঢেউ ফুটছে না ঠিকমতো। অবনীন্দ্রনাথ তুলি কেড়ে নিয়ে চায়ের জলে নীল রঙের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়ো মিশিয়ে স্ট্রোকে স্ট্রোকে ফুটিয়ে তুললেন ঢেউ। মুকুল দিনের পর দিন সেখানে বসে ছবি আঁকেন কিন্তু ছবি রং তুলি কাগজ কিছুই বাড়ি নিয়ে যান না। একদিন সকালে এসে দেখেন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, তাঁর গুরুদেব তাঁরই বাতিল কাগজে তাঁরই রং তুলি নিয়ে বসে ছবি আঁকছেন, শুরু করেছেন কবিকঙ্কণ সিরিজের ছবি আঁকতে। শিষ্যের অভিসন্ধি সফল, দশ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান।

শেষ কথা

তারপর একদিন এই দক্ষিণের বারান্দা ছাড়তে হল অবনীন্দ্রনাথকেও। বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল সময়ে জমিদারির আয় গিয়েছিল কমে, দেনা ছিল কিছু কিন্তু তার জন্য বেচে দিতে হল বাড়ি। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি মাথা ঘামাননি কোনওদিন। তা বলে তাঁর ইচ্ছের মর্যাদা দিতেও এগিয়ে এল না কেউ। প্রথমে বিক্রি, তারপর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দ্বারকানাথের এই বাড়ি। পুরীতে যাঁর প্রায় একার উদ্যোগে রক্ষা পেয়েছিল গুণ্ডিচা মন্দিরের স্থাপত্য, তাঁর নিজের বাড়িটি অক্ষুণ্ণ রইল না। সংস্কারের নামে গুণ্ডিচা মন্দির ধ্বংস করে টালি দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা অবনীন্দ্রনাথের জানা ছিল না। পাণ্ডা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন পাথরের হরিণ কেনাতে। বিক্রির উদ্যোগ চলছিল সেইসব স্থাপত্যের। দেখে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল তাঁর। কালবিলম্ব না করে ছুটে এলেন কলকাতায়। চলল দৌড়োদৌড়ি। শেষে পুরীর কমিশনারের কাছে গেল পুরনো গঠন, স্থাপত্য অক্ষুণ্ণ রেখে সংস্কার প্রক্রিয়া চালু রাখার জরুরি নির্দেশ। পাথরের বড় বড় মূর্তি যা নামানো হয়েছিল মন্দিরের গা থেকে, তাদের অবিকল সেইখানে স্থাপনের খবর পেয়ে আশ্বস্ত হলেন অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু নিজের বেলা অসহায় হতাশায় একরাশ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সপরিবারে চলে আসতে হল বরাহনগরের গুপ্তনিবাসে। আর ফিরে আসেননি কোনওদিন তাঁর স্বপ্ন আর সাধের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।

জাতিস্মর হয়ে সারনাথে তাঁর গতজন্মের দালান কোঠার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ''দেখেই মনে হল এ আমার ঘর, এইখানে আমি থাকতুম, পুতুল গড়তুম, বেচতুম... তখন সন্ধে হচ্ছে। বরুণা নদী, একটি সাদা বক ওপার থেকে এপারে ফিরে এল।... মাটির ওপর ছোট একটি ঘর, আরো ছোট তার দরজা। দরজার চৌকাঠের ওপর দুটি হাঁস আঁকা। চৌমাথা, কুয়ো সামনে একটি, যেন রাস্তার ধারে ঘরখানি। দেখেই মনে হল যেন আমার নিজের ঘর, কোনোকালে ছিলুম।... নেলিকে বললুম ওরে দেখ দেখ ওইখানে বসে আমি পুতুল গড়তুম; তারই দু চারটে ওই যে পড়ে আছে এখনও।''[২১]

গতজন্মের সেই পুতুল নিয়েই তিনি কাটিয়েছিলেন এ-জন্মের শেষবেলা। ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র, যাদের ফেলতে মোটে মন চাইত না তাঁর, তারা ছিল তাঁর কুটুম, তাদের কাঠাম নিয়েই গড়েছিলেন কুটুম-কাটাম। গাছের ভাঙা ডাল, শিকড়, ফেলে দেওয়া চটের কাপড়, কাঠের টুকরো, তালের আঁটি, কৌটো কাটা, নারকেলের মালা, আরও কত কিছুর বিমূর্ত অবয়বে মূর্ত হয়ে উঠত কত ভাষা আর ভাব। তৃতীয় নয়ন দিয়ে না তাকালে তার সৌন্দর্য বোঝে কার সাধ্যি। পুতুল নয় এরা, এরা এক আশ্চর্য সৃষ্টি। ছবি এঁকে যখন মন ভরে না, তখন তিনি খোঁজেন এমন কিছু গড়তে যার মধ্যে আছে 'নতুনের আনন্দ'। রূপের মধ্যে অরূপ এবং অপরূপের সন্ধান করে ফেরেন তিনি। সৃষ্টির নেশা তাঁকে ছেড়ে যায়নি, তাঁকে নিয়ে গেছে অন্য ছায়াপথে। চিরাচরিত পথের মানুষ তো তিনি নন। তিনি চলেন নিজের খেয়ালে নতুন পথে; অন্তরের সেই তৃতীয় চোখ দিয়ে চেয়ে দেখেন তাঁর কুটুম-কাটামকে, তাদের সৌন্দর্যকে। সে-নির্মিতির বাহারি সৌকর্য নেই, আছে রসমাধুর্য যা অনুভবের, যা কাব্যের রসের মতোই 'সহৃদয়হৃদয়সংবেদী'।

সুদূর অতীতের ভারতবর্ষেই নিহিত ছিল তাঁর শিল্পের শেকড়, রসসৃষ্টির উৎসে ছিল আনন্দের সংযোগ, মোগল মিনিয়েচার বা কাংরার ছবি, রাজপুতানার ছবি বা পট, পাটনাই কলমের ছবি বা ওড়িশার কাঠের কাজ, জাপানি চিত্রকলার ঐশ্বর্য—সবকিছুকে তিনি তাঁর সৌন্দর্যসাধনায় সম্মিলিত করেছিলেন কিন্তু অনুকরণের বাঁধা পথে নিজেকে বেঁধে রাখেননি, তাকে নিজের মতো করে প্রয়োগ করেছেন, রূপের মধ্যে অপরূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সেই অপরূপের সন্ধানেই খুঁজেছেন বৈচিত্র্য, রচনা করেছেন নতুন নতুন অভিযান, এঁকেছেন নতুন মানচিত্র। শাশ্বত ভারতাত্মার প্রতীক অবনীন্দ্রনাথ। জীবনের প্রান্তবেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাজ্ঞদৃষ্টিতে তাই অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর প্রিয় অবনের প্রসঙ্গে বলে গিয়েছিলেন : ''আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয়ঘোষণায় আত্মাবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করি।''✠ *সমাপ্ত*

তথ্যসূত্র

১৭। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, *অবনীন্দ্র-চরিতম*, (রূপা : কলকাতা, ১৯৮৭), পৃঃ ৪৬ [এরপর *অবনীন্দ্র-চরিতম*]

১৮। জসীম উদ্দীন, ঠাকুর-বাড়ির আঙিনায়, (গ্রন্থ প্রকাশ : কলকাতা, ১৩৭৬) পৃঃ ৪৫

১৯। অবনীন্দ্র-চরিতম, পৃঃ ৫৪-৫৭

২০। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, *দক্ষিণের বারান্দা* (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : কলকাতা ১৩৯৭), পৃঃ ১৫১

২১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জোড়াসাঁকোর ধারে* (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : কলকাতা ১৩৯৮), পৃঃ ১৮৪